ভারত কী করে ভাগ হলো

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ভারত কী করে ভাগ হলো- এ প্রশ্ন নিয়ে ১৯৪৭ সালের পর একাধিক বই বেরিয়েছে। পুরোনো সরকারী দলিলপত্র তথা সে যুগের রাজনীতিকদের আত্মজীবনীমূলক পুস্তকাদি যতই বেরুচ্ছে ততই অনেক রহস্য উদঘাটিত হচ্ছে। ভারত পার্টিশনের অব্যবহিত পর একতরফাভাবে মুসিলম লীগ, বিশেষ করে মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে দোষী সাব্যস্ত করে বৃটিশ দালাল-সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ দাস ইত্যাদি উপাধি তাঁর উপর বর্ষিত হতো। বলা হতো যে, মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ধূয়া না তুললে বা যদি আপোষ করার কোন সদিচ্ছা মুসলিম নেতাদের থাকত তাহলে ভারত বিভাগ প্রয়োজন হতো না। কংগ্রেস নেতাদের কোন দায়িত্ব এর মধ্যে থাকতে পারে- এ কথাটা কেউ আলোচনা করতে রাজি ছিলেন না। পাকিস্তানের সমর্থনে দেশে-বিদেশে যখনই কোন বই বা আলোচনা বেরিয়েছে তাকে ইতিহাসের বিকৃতি আখ্যা দেয়া হয়েছে।

> ভারতীয় লেখকদের যুক্তিতে স্ববিরোধিতা থাকলেও সেটাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কেউ আমল দেয়নি। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় তাঁরা কখনও কখনও স্বীকার করেছেন ভারত উপমহাদেশের নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কথা। বলেছেন যে, এদিক দিয়ে ইউরোপের চেয়ে বেশী বৈচিত্র্য ভারতে বিদ্যমান। কিন্তু তবু ভারত এক জাতি একথা বলতেও তাঁদের কুণ্ঠা হয়নি। এই জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকে বিপাকে পড়েছেন। আচারে, ব্যবহারে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, সামাজিক জীবনধারায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারতকে কেন এক জাতি বলা হবে- এর কোন বিতর্কাতীত সংজ্ঞা কেউ উপস্থাপিত করতে পারেনি, যা আমরা পেয়েছি, সে হচ্ছে শুধু অযৌক্তিক আস্ফালন। জওহরলাল নেহেরুর মত ব্যক্তি তাঁর ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়াতে যখন ভারতবর্ষের সত্যিকারের রূপের আবিষ্কার করতে গেলেন, যেরূপ তিনি উদঘাটন করলেন তা হচ্ছে হিন্দু ভারতের রূপ, ভারতের মধ্য যুগের সমস্ত ইতিহাস তাঁর সংজ্ঞায় স্থান পেল না। কারণ, সে ইতিহাস ছিল মুসলিম যুগের ইতিহাস। স্থাপত্যে, সাহিত্যে, ললিত কলায়, জীবনধারায় মুসলমানেরা যা কিছু করেছিলেন- যার ছাপ কখনও নিশ্চিহ্ন হবার নয়। তাকে নেহেরু আমল দিলেন না।

তেমনি অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় সংস্কৃতির উপর যে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সেটা ছিল গীতা-নির্ভর সংস্কৃতি। তার মধ্যে ইসলামের কোন স্থান ছিল না। ডঃ তারাচাঁদের মতো পণ্ডিত কেউ কেউ ভারতীয় জীবনে ইসলামের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কোন হিন্দু নেতা সে কথা কার্যত স্বীকার করেননি। অন্যদিকে বইপত্রে দেশী-বিদেশী সব পণ্ডিত মুসলিম ও হিন্দু- এই দুই প্রধান গোষ্ঠীকে দুই ভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস পতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম জাতীয়তাবাদের উপর ততটা জোর ছিল না, যতটা ছিল সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের উপর। তখনই কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের মত দূরদর্শী ব্যক্তিরা মুসলমানদের হুশিয়ার করে দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন যে, যেখানে দুই গোষ্ঠীর স্বার্থ অভিন্ন নয়, সেখানে একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ, কংগ্রেস যখন জাতীয়তাবাদের কথা বলতে শুরু করল, দেখা গেল সেটা হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামান্তর মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্য নেতারা তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন তখন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের স্বরূপ আরও বেশী করে প্রকট হয়ে উঠল। গান্ধী প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। রামরাজ্যের আদর্শের কথা বললেন, রামরাজ্য বলতে যে আদর্শের চিত্র মুসলিম মানসে প্রতিভাত হয়, সেটা যে একান্তভাবে হিন্দু আদর্শ- সে আপত্তিতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। মুসলমানরা কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগল।

তবে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের আগেই হিন্দু রাজনীতির চরিত্র ধরা পড়েছিল। এ ঘটনা পরম্পরার মধ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গে পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল এই কারণে যে, এর ফলে তারা অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিল কিন্তু হিন্দুরা পার্টিশনের বিরোধিতা করে যে তুমুল সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করে তা ছিল মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। দূর্গার সামনে শপথ নিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা কাজে নামত। পার্টিশনের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল যে, এতে হিন্দু জমিদার ও মহাজনের ক্ষমতা ও প্রভাব লাঘবের আশংকা দেখা দিয়েছিল।

এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের সত্যিকার রহস্য ধরা পড়ে। প্রথম প্রথম তারা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের কথা বলেনি। হিন্দুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বৃটিশরা যে ভারত সৃষ্টি করে তার আওতার মধ্যে ভবিষ্যত রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা হতে দিল না কংগ্রেস।

এ সমস্ত কথা নতুন নয়। মুসলিম লেখকরা একাধিকবার এসব কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত-- এই বলে তাঁদের সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান ভারতে এ সম্বন্ধে যাঁরা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে ইদানীং একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিছুকাল আগে অন্নদা শংকর রায়ের ভূমিকা সম্বলিত 'জিন্না : পাকিস্তান : নতুন ভাবনা' নামক যে বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে ১৯৪৭ সালের পার্টিশন সম্বন্ধে অনেক সত্য কথা আছে, যদিও লেখক এবং অন্নদা শংকর রায় উভয়েই নিজেদের তথ্যবিরোধী এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একদিকে তারা দেখিয়েছেন যে, নেহেরু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাতিল করায় ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, এ জন্য কায়েদে আজম জিন্নাহকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই স্ববিরোধিতার জন্য বইটির মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। কারণ, পাঠক মাত্রই প্রশ্ন করে যে, নেহেরুর সিদ্ধান্ত যদি ভারত বিভাগ অনিবার্য করে তোলে তবে জিন্নাহকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে কেন?

এদিক থেকে সদ্য (১৯৯১) প্রকাশিত 'ভারত কী করে ভাগ হলো'? বইখানা সম্পর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। লেখক বিমলানন্দ শাসমল নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিন্দু সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদের অংকুর ঐ সমাজের মূল বিশ্বাসগুলোর মধ্যে নিহিত ছিল। তাঁর সাহস, নির্ভীকতা বিস্ময়কর। তিনি যেখানে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তা উপস্থিত করতে দ্বিধা করেন নি।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে হিন্দু হয়েও বিমলানন্দ শাসমল স্বীকার করেনে যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের জাতিভেদ প্রথার জন্য অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিকাশ অসম্ভব। জাতিভেদ আবার প্রতিষ্ঠিত কর্মবাদের উপর। সমাজের যত অনাচার যার ফলে নিম্নবর্গের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হয়ে আসছে তাকে বলা হয়েছে পূর্ব জন্মের কর্মফল, অর্থাৎ এর জন্য উপরের কোন শ্রেণী দায়ী নয়। এভাবেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আধিপত্য সমাজে পাকা করা হয়।

এর পেছনে যে স্বার্থপরতা কাজ করেছে তার প্রভাব অহিন্দু সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের উপর এসে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী রূপে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা চেয়েছে চিরকাল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে। তারা যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ও সুবিধা করায়ত্ত করেছে তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক, এ রকম আশংকা দেখা দিলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ শাসমল বৃটিশ ভারতের রাজনীতির পর্যালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কংগ্রেস প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিল যে, হিন্দু স্বার্থ ভিন্ন আর কোন স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন ঘটতে পারে না। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং তজ্জনিত স্বার্থবোধ অন্যরূপ হতে পারে- এ ধারণা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আলোচনা করতেই প্রস্তুত ছিলেন না।

বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। কিন্তু হিন্দুরা তাদের জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর স্বার্থকে জাতীয়তাবাদ বলে চালিয়ে দিয়েছিল। লেখক দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল মুসলমানবিরোধী।

হিন্দুদের মধ্যে যে উদারপন্থী কেউ ছিলেন না, তা নয়। লেখকের পিতা বীরেন্দ্র শাসমল সন্ত্রাসবাদীদের সমালোচনা করেছিলেন বলে তাকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনি বাংলার মুসলমানদের সমস্যা বুঝতেন। কিন্তু সুভাষ বসু, শরৎ বসু, বিধান রায় এরা তাঁকে সমর্থন না করে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করেন।

উদারপন্থী আরেক ব্যক্তি ছিলেন চিরত্তরঞ্জন দাস বা সি আর দাস। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের পেছনে ফেলে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হবে না। এই অনুভবের প্রেরণায় ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন সুভাষ বসু সেই প্যাক্ট প্রত্যাখান করলেন তখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাটুকু বিলীন হয়ে গেল।

বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদের বিশেষ কোন সুবিধা দেয়ার কথা ছিল না। শুধু এই স্বীকৃতি ছিল যে, চাকরিতে এবং আইন পরিষদে তারা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে। শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে এতদিন তারা অবহেলিত, সি আর দাস বোঝাতেন যে, মুসলমানদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে না পারলে তার অকুণ্ঠচিত্তে স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হতে পারবে না। কিন্তু তাদের শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি দিতে হবে, হিন্দুদের ভাগে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। এটা অন্য হিন্দু নেতাদের সহ্য হল না। আরও মজার কথা- প্যাক্টে একথাও ছিল যে, মুসলমানদের মনে আঘাত লাগে এ জন্য মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো চলবে না। কংগ্রেস হিন্দুরা এখন আরো বেশী করে মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করতে লাগলেন। পটুয়াখালীতে যে ব্যক্তি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন স্থানীয় নেতা সতীন সেন। বিমলানন্দ শাসমলের ভাষায় : "বরিশালের নেতা সতীন সেন পটুয়াখালীতে এক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। যাতে প্রতিদিন সত্যাগ্রহীরা মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতেন এবং এই বেআইনী শোভাযাত্রা বেআইনী কাজ করে গ্রেফতার বরণ করতেন। সতীন সেন বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন"। (১০৭ পৃষ্ঠা)

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের জের স্বরূপ বরিশাল শহরে দাঙ্গায় ২১ জন নিরস্ত্র দরিদ্র মুসলমান পুলিশের গুলীতে মারা পড়ে।

পটুয়াখালির এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে, মসজিদের সামনে বাজনা বাজাবার এই আন্দোলন কংগ্রেসের অন্দোলনের সাথে পরিচালিত হয়েছিল এবং এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় হিন্দু নেতারা যেমন কোন কথা বলেননি, তেমনি বঙ্গদেশীয় কংগ্রেস নেতারাও প্রতিবাদ করেননি।

এরপর কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে কোন সংশয় থাকবার কারণ ছিল না।

> এ রকম বহু ঘটনার উল্লেখ বিমালনন্দ শাসমল করেছেন। যেমন ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা করতে চাইলে গান্ধী এতে সম্মতি দিলেন না। একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্ত প্রদেশে (বর্তমানে উভয় প্রদেশ) মুসলিম লীগ ঠিক অনুরূপ প্রস্তাব কংগ্রেসকে দিয়েছিল, জওহারলাল নেহেরু সেটা নাকচ করেন। তিনি বললেন, মুসলিম লীগের সদস্যরা যদি পার্টি থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন তবেই এ রকম সহযোগিতা সম্ভব। বিমলানন্দ শাসমলের মতে, কংগ্রেসের নেতৃবর্গের হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতার দরুনই ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাসের সঞ্চার হয় যে, অবিভক্ত ভারতে সসম্মানে জীবন ধারণের কোন আশা তাদের নেই। ১৯৪০ সালের লাহোরে তথাকথিত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলেন, তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবকালে পাওয়া গেছে। মিঃ শাসমলের আগেও অনেকে স্বীকার করেছেন যে, ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হয় গান্ধী এবং নেহেরুর অযৌক্তিক আচরণে। মওলানা আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে, নেহেরু যদি মিশন প্রস্তাব নাকচ করে না দিতেন তবে ভারতবিভাগের প্রয়োজন পড়ত না। শাসমল তার সমর্থনে আরও যুক্তি দেখিয়েছেন।

কায়েদে আজম জিন্নাহর কাছে পাকিস্তান শেষ কথা ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে রাজী ছিলেন। আমরা কংগ্রেসের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া গঠনের প্রস্তাবও শুনিনি। তারা আগাগোড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে মেতেছিলেন। বিমলানন্দ বারবার স্বীকার করেছেন যে, এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের স্বপ্নের কোন তফাৎ ছিল না।

কংগ্রেস যে সত্য কখনই স্বীকার করেনি, কোন কোন হিন্দু নেতা সে কথা বলেছেন। ১৯২৩ সালে ভাই পরমানন্দ বলেছিলেন,

ভারতকে হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতে বিভক্ত করাই গণতন্ত্রসম্মত হবে। পাকিস্তান ও ভারত অনেকটা সেই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। কিন্তু কংগ্রেস আগাগোড়া জিদ ধরে যেমনি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারল না, তেমনি ১৯৪৭ সালের মীমাংসাও নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে পারল না। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে তিক্ততা তার মূল এখানেই।

১৯৬২ সালে নয়াদিল্লীতে আমি একবার জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন যে, ভারতের কালচারের ভিত্তি হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। প্রকাশ্যত যে কালচারের কথা ভেবে নেহেরুর মুখে এই উক্তি উচ্চারিত হয়, সেটা যে হিন্দু কালচার- তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। সাতশ' বছর ধরে মুসলমানরা ভারতের বুকে যে সভ্যতা ও কালচারের সৃষ্টি করেছিল নেহেরু তাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কালচারের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিলেন। হিন্দু হিসাবে একথা বলার অধিকার তার অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনিই তো ধর্মনিরপেক্ষ কালচারের কথা সবচেয়ে বেশী করে বলতেন।

একদিকে নেহেরুর বক্তৃতায় আমি যেমন বিস্মিত হয়েছি, অন্যদিকে তাঁর স্পষ্টবাদিতার প্রশংসাও করেছি। ভেবেছি, তাঁর রাজনীতিতে যদি বাস্তববাদিতা প্রকাশ পেত- অভিবক্ত ভারতকে এত দুঃখ পোহাতে হত না।

যে নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হল ১৯৪৭ সালে, সেই নীতি অনুসারে কাশ্মীর পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার কথা। এখানেও নেহেরু এমন এক নীতি অবলম্বন করলেন যার ফলে প্রকাশ্যে জাতিসংঘে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভারত ভঙ্গ করতে বাধ্য হল। কিন্তু আবার প্রশ্ন করব, বিনিময়ে ভারত পেয়েছে কি? কাশ্মীরের সমস্ত মানবাধিকার আজ লুপ্ত। অমানুষিক নির্যাতন করে কাশ্মীর অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা, নেহেরুর উত্তরসুরিরাও নেহেরুর সেই অযৌক্তিক স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে আছেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে কাশ্মীরীরা যেমন প্রাণ হারাচ্ছে, তেমনি ইন্ডিয়ান সৈন্য বাহিনীরও ক্ষতি হচ্ছে। তবু এই নৃশংস নাটকের কোন অবসান নেই। কোনো শর্তেই ভারত কাশ্মীরে গণভোট হতে দেবে না। সে জানে, ভোটের ফল কি হবে। এটা কি গণতন্ত্রের কথা না-কি নিছক সাম্রাজ্যবাদ?

আমরা আনন্দিত যে, বিমলানন্দ শাসমলের মতো সৎ সাহসী ব্যক্তি হিন্দু জাতীয়তাবাদের মুখোশ খুলে ফেলতে এগিয়ে এসেছেন। বিভক্ত ভারতকে আবার জোড়া লাগিয়ে এক রাষ্ট্রে পরিণত করার যে চেষ্টা ভারতীয় কূটনীতির মূল চাবিকাঠি, সেটা পরিত্যক্ত হলে এখন এই উপমহাদেশের জনগণের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে বলে আমরা মনে করি এ জন্য চাই পরম সত্যনিষ্ঠা। তারই একটি উদাহরণস্বরূপ বিমলানন্দ শাসমলের বই-এর যথার্থ মূল্য।

সূত্রঃ মেসবাহ উদ্দীন আহমাদ সম্পাদিত ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন স্মারক গ্রন্থ

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যে পণ্ডিত এবং লেখক। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন নিজস্ব মেধার কারণেই সেই সময়কালের পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ের লেখাপড়া কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই ঢাকায় গঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয় এবং তিনি এর চেয়্যারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রী করেন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। এ সময় তিনি কলকাতার ইংরেজি কমরেড পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখতেন। "কমরেড" ছিল মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ইংরেজি ভাষার মুখপত্র স্বরূপ। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয় এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে চেয়্যারম্যান নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি সিলেটের এম,সি, কলেজে বদলী হন এবং এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দুবছরে গবেষণা কাজ শেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বিশ বছর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদ থেকে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান পর্যন্ত সকল পদে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭১-এর জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পদে বদলি হন। ১৯৭১ সালের পর সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে না পেরে তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং সৌদী আরবে শিক্ষকতা শুরু করেন। মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির অধ্যাপকের চাকুরী করতেন। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য মক্কা থেকে পূর্ণ অবসর নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তিনি অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।